﴿ عيد ميلاد النبي، التأسيس والمؤسس: دراسة تأريخية ﴾

« باللغة البنغالية »

الأستاذ الدكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

مراجعة: الدكتور أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী প্রবর্তন ও প্রবর্তক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম মহান রাসূল, আল্লাহর হাবীব ও মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গীদের উপর। আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মার অন্যতম উৎসবের দিন হচ্ছে ‘‘ঈদে মীলাদুন্নবী’’। সারা বিশ্বের বহু মুসলিম অত্যন্ত জাঁকজমক, ভক্তি ও মর্যাদার সাথে আরবী বৎসরের ৩য় মাস রবিউল আউআল মাসের ১২ তারিখে এই ‘‘ঈদে মীলাদুন্নবী’’ বা নবীর জন্মের ঈদ পালন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমই এই ‘‘ঈদের’’ উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এই উৎসব মুসলিম উম্মার মধ্যে প্রচলন করেছিলেন তাঁদের পরিচয়ও আমাদের অধিকাংশের অজানা রয়েছে। এই নিবন্ধে আমি উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনার চেষ্টা করব।

১) ঈদে মীলাদুন্নবী: পরিচিতি:

ক) ‘‘মীলাদ’’ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: জন্মসময়। এই অর্থে ‘‘মাওলিদ’’ শব্দটিও ব্যবহৃত হয়[1]। আল্লামা ইবনে মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান ‘‘লিসানুল আরবে’’ লিখছেন: "ميلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد فيه" অর্থাৎ: ‘‘লোকটির মীলাদ: যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম।’’[2] স্বভাবত:ই মুসলিমগণ ‘‘মীলাদ’’ বা ‘‘মীলাদুন্নবী’’ বলতে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বোঝান না। বরং তাঁরা ‘‘মীলাদুন্নবী’’ বলতে রাসূলুল্লাহ্র (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করাকেই বোঝান। আমরা এই আলোচনায় ‘‘মীলাদ’’ বা ‘‘ঈদে মীলাদুন্নবী’’ বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম উদযাপন বুঝাব। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোন আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোন দিনেই হোক যে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম পালন করাকে আমরা ‘‘মীলাদ’’ বলে বোঝব। শুধুমাত্র তাঁর জীবনী পাঠ, বা জীবনী আলোচনা, তাঁর বাণী, তাঁর শরী‘আত বা তাঁর হাদীস আলোচনা, তাঁর আকৃতি বা প্রকৃতি আলোচনা করা মূলত: মুসলিম সমাজে মীলাদ বলে গণ্য নয়। বরং জন্ম উদযাপন বা পালন বা জন্ম উপলক্ষে

---

[1] ড: ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর) ২/১০৫৬।

[2] ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত, দারু সাদের) ৩/৪৬৮।

কিছু অনুষ্ঠান করাই মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী হিসেবে মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত।

খ) "মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন:

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। স্বভাবত:ই আমরা যে কোন ইসলামী আলোচনা কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে শুরু করি। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের "মীলাদ" অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন করীমে পূর্ববতী কোন কোন নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনভাবে কোন দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয় নি। অনুরূপভাবে "মীলাদ" পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয় নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এর আত্মিক প্রেরণার ধারাবাহিকতা ব্যহত করা হয় নি। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত: হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক ও আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করব:

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন:

হাদীস বলতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম, অনুমোদন বা তাঁর সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহাবীগণের কথা, কর্ম বা অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে।[3] হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও তাঁর সাহাবাগণের মতামত সনদ বা বর্ণনাসূত্রসহ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে "আল-কুতুবুস সিত্তাহ" নামে প্রসিদ্ধ ৬টি অতি প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার, জন্মদিন ও জন্মতারিখ সম্মন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

এক. জন্মবার:

---

[3]আব্দুল হাই লাখনাবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই, দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৩১-৩৪ পৃ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيه"

আবু কাতাদা আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন: ‘‘এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়ত পেয়েছি।’’[4] ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ"

ইবনে আববাস বলেন: ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।’’[5]

এভাবে আমরা হাদীস শরীফ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বার জানতে পারি। সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।

দুই. জন্ম বৎসর:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৎসর বা জন্মের সাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلادِ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. رواه الترمذي وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ."

কায়স ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজনেই ‘‘হাতীর বছরে’’ জন্মগ্রহণ করেছি। উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুবাস ইবন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন: আপনি বড় না

---

[4]সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখবিহীন) ২/৮১৯।

[5]আহমাদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনাদ (মিসর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬ (সম্পাদক আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়? তিনি উত্তরে বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "হাতীর বছরে" জন্মগ্রহণ করেন।"[6] হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল।[7]

তিন. জন্মমাস ও জন্ম তারিখ:

এভাবে আমরা হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৎসর ও জন্ম বার সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একারণে পরবতী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন: আলেমগণ ও ঐতিহাসিকদের মতামত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কে যেহেতু হাদীসে রাসূলের হাদীসে কোন বর্ণনা আসে নি এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ, ইবনে কাসীর, কাসতাল্লানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন:

1) কারো মতে, তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায় নি, এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

2) কারো কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

3) অন্য মতে, তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

4) কারো মতে, তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ ইবন আব্দুর রহমান আস-সিনদী (১৭০হি:) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

5) অন্য মতে, তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউআল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা

---

[6] তিরমিযী, আল-জামিয়, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

[7]আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২) ১০৯-১১০ পৃ।

কাসতাল্লানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনে আববাস ও জুবাইর ইবন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫হি:) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (১০০হি:) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন: ‘‘মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর ইবন মুতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬হি:) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮হি:) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি:) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হি:) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত ‘‘আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর’’ গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

6) অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১০ই রবিউল আউয়াল। এই মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আলী আল বাকের (১১৪হি:) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবন শারাহিল আশ শা‘বী (১০৪হি:) থেকেও এই মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭হি:) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে সা‘দ তার বিখ্যাত ‘‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’’-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[8]

7) কারো মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১হি:) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।’’[9] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনে ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত: সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানান নি বা সনদসহ প্রথম

---

[8]ইবনে সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়েত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭।

[9]ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮)১/১৮৩

শতাব্দীর কোন সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেন নি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[10]।

8) অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল।

9) অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ শে রবিউল আউয়াল।

10) অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

11) অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ করেছেন। ।

12) অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্কার (২৫৬ হি:) থেকে এই মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুয়ত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুয়ত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে।[11]

২) মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস পালন বা উদযাপন:

ক) পূর্বকথা:

উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার, জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলির আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা উদযাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এধরণের মতবিরোধের কোন সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করছে।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে “ঈদে মীলাদুন্নবী” পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম

[10]মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯ পৃ।

[11]ইবনে সা’দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮, ইবনে রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ, প্রাগুক্ত ১/১৫০ ।

সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলিতে ‘‘ঈদে মীলাদুন্নবী’’ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করা বা উদযাপন করার কোন প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে হাজর আল-আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২হি: ১৪৪৯খ্রি:) লিখেছেন: ‘‘মাওলিদ পালন মূলত: বিদ‘আত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনদের কোন একজনও এ কাজ করেন নি।’’[12]

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত মুদাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যু: ৯০২হি: ১৪৯৭খ্রি:) লিখেছেন: ‘‘ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনদের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের) কোন একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা খুজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তারা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এ মাসের রাত্রে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দপ্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশী করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন।’’[13]

লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ দিলদার আলী (১৯৩৫খ্রি:) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: ‘‘মীলাদের কোন আসল বা সুত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোন সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয় নি; বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।’’[14]

আলেমদের এই ঐক্যমতের কারণ হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধশতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটিও সহীহ বা দুর্বল হাদীসে দেখা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী

---

[12]আস-সালেহী, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ (বৈরূত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬

[13]আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২

[14]সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর), ১৫ পৃ।

সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বৎসরের কোন সময়ে কোন অনুষ্ঠান করেছেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকান্ডের মূল। তাঁরা রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁর ভালবাসায় চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোষাক আশাকের কথা আলোচনা করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেন নি। এমনকি তাঁর জন্মমুহুর্তের ঘটনাবলী আলোচনার জন্যও তাঁরা কখনো বসেন নি বা কোন দান-সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেন নি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল।

বস্তুত: কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন ‘‘আ’জামী’’ বা অনারবীয় সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচারণে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারসিয়ান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম।

খ) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রাথমিক প্রবর্তন ও সীমিত উদযাপন:

আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগগুলোর পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন?? আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই এবং কিভাবে তাঁরা এই অনুষ্ঠান পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি।

ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোন দিবসকে সামাজিক ভাবে উদযাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্দোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩খ্রি:) বাগদাদের আববাসী খলীফার প্রধান

প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ই মুহাররাম আশুরাকে শোক দিবস ও জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ গাদীর খুম দিবস উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই দুই দিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন, তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বৎসরে এই উদযাপনে বাধা দিতে পারেন নি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিবস উদযাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[15]

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাঈলী শিয়াগণ[16] ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রি:) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবতী ২ শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২খ্রি:) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।[17] এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন পালন করতেন: ১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন, ২) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন, ৩) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্মদিন, ৪) হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন ও ৫) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন। এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন পালন করতেন এবং ''মীলাদ'' নামে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস), যা মিশরের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দপ্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতেন।[18]

---

[15]ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত ৭/৬৪২, ৬৫৩, ৮/৩, ৯, ১১, ১৫, ১৬,. ১৭, ...

[16]আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপুরুষ।

[17]বিস্তারিত দেখুন: মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ ইং) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

[18]আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কাইরো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়্যাহ) ৪৯০-৪৯৫ পৃ।

গ) ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি:

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হয়। এ যুগকে আববাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকগণ। আববাসীয় খেলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ২৩২ হি: (৮৪৭খ্রি:) ৯ম আববাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সূচনা হয়। কারণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এসকল রাষ্টের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যহত হয়। বিশেষ করে ৩৩৪ হি: (৯৪৫খ্রি:) থেকে বাগদাদে শীয়া মতাবলম্বী বনূ বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যান, ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণ ব্যহত হয়। রাফেযী শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত। এ সকল সংঘর্ষ মূলত: দেশের সার্বিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটাত। আভ্যন্তরীন অশান্তি ও অনৈক্য বহির্শত্রুর আগ্রাসনের কারণ হয়। এশিয়া মাইনর, আর্মেনীয়া, ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খ্রিষ্টান শাসক সুযোগমত ইসলামী সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে থাকেন। এছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম বিরোধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে।[19]

এই যুগের বিচ্ছিন্ন ইসলামী সম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ ও ইসলামী সভ্যতার অনত্যম কেন্দ্র মিশরে ফাতেমী খলীফা আল-মুয়িজ্জু লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নবী, অন্যান্য জন্মদিন পালন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের শুরু করেন।[20] তিনি ৩৫৮ হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং কায়রো শহরের পত্তন করেন। তিনি

---

[19]বিস্তারিত দেখুন: ইবনে কাসীর: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, মাহমূদ শাকির, আত-তারিখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ট খন্ড।

[20]বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯ ইং) ১৫/১৪১-১৫৯, আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৯৮০) ১/১৯১-১৯৮, ওয়ামী, আল-মাউসূয়া আল-মুয়াসসারা (রিয়াদ, ওয়ামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮) ৪৫-৫২ পৃ।

সিরিয়া ও হেজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাঁর অধীনে আনেন। ৩৬২ হিজরীতে (৯৭২খ্রি:) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ করেন এবং কায়রোকেই তাঁর রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। ৩৬৫ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শাসনামলে মিশরে শিয়া শাসকদের যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব।[21]

আল মুয়িজ্জ এর প্রচলিত এই ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন পালন ও উদযাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই উৎসব চালু থাকে। ৪৮৭ হি: (১০৯৪ খ্রি:) ফাতেমী খলীফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি আল-আফযাল ইবন বদর আল-জামালীর সহযোগিতায় মুস্তানসিরের ছোট ছেলে ২১ বৎসর বয়স্ক আল-মুস্তা'লী খলীফা হন। সেনাপতি আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন ফাতেমী শাসক পুনরায় এ সকল উৎসব সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এ সকল উৎসব জৌলুস হারিয়ে ফেলে।[22]

ঘ) ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: অনুষ্ঠান পরিচিতি

আহমদ ইবন আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১হি:) লিখেছেন: ‘‘রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ফাতেমী শিয়া শাসক মীলাদুন্নবী উদযাপন করতেন। তাদের নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টান্ন তৈরী করা হত। এই মিষ্টান্ন ৩০০ পিতলের খাঞ্চায় ভরা হতো। মীলাদের রাত্রিতে এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যেমন প্রধান বিচারক, প্রধান শিয়া মত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। এ উপলক্ষে খলীফা প্রাসাদের সামনের ব্যালকনীতে বসতেন। আসরের নামাযের পরে বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংগে আজহার মসজিদের গমন করতেন এবং সেখানে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় বসতেন। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ করতেন। এরপর কারীগণ কুরআন তিলাওয়াত

---

[21]যাহাবী, নুবালা , ১৫/১৬৪। আরো দেখুন: ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কুম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮, আল-যিরিকলী, আল-আলাম বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০) ৭/২৬৫।

[22]ইজ্জত আলী আতিয়্যা, আল-বিদয়াত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০) ৪১১ পৃ, ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (সৌদী আরব, রিয়াদ, আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহুস, ১৯৮৫) ৬৪-৭২।

করতেন এবং বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম জানাতেন। খিড়কী বন্ধ করা হতো এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরতেন। এভাবেই তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিনও পালন করত...।"[23]

আহমদ ইবন আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫হি:) এ সকল জন্মদিন উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: "এ সকল জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময়। এ সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক তৈরী করত, বিভিন্ন ধরণের খাবার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরী করে বিতরণ করা হতো।"[24]

৩) ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদযাপন:

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কায়রো এই উৎসব ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। সম্ভবত: ইসমাঈলীয় ফাতেমী শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এই উৎসবসমূহ অন্যান্য সুন্নী এলাকায় জনপ্রিয়তা পায় নি বা সামাজিক উৎসবের রূপ গ্রহণ করে নি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০) থেকেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের ২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বৎসর রবিউল আউআল মাসের প্রথমাংশে বা ৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে "ঈদে মীলাদুন্নবী" পালন করতে শুরু করেন।[25]

তবে যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাক অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক আবু সাঈদ কূকবুরী (মৃত্যু: ৬৩০হি:)। পরবতী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা তার জীবনী ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনে তাঁর পদ্ধতি আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা যে যুগের প্রেক্ষাপটে তিনি এই উৎসবের প্রচলন করেন তা আলোচনা করব।

ক) যুগ পরিচিতি: হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতক:

৪র্থ হিজরী শতকে ইসলামী জগতের অবস্থা কি ছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়ে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি

---

[23]আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা (মিশর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়) ৩/৪৯৮-৪৯৯। অথচ এটাও সত্য যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন নির্ধারণও কোন প্রমাণিত বিষয় নয়।

[24]আল-মাকরীযি, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার , প্রাগুক্ত,   ৪৯১ পৃ।

[25]আস-সালেহী, সীরাত শামীয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১/৩৬৩, ৩৬৫।

থেকে ৭ম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কাল ছিল মুসলিম উম্মার জন্য দুর্দিন ও মুসলিম ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। এ সময়ে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাইরের শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বিশাল মুসলিম রাজত্বের অধিকাংশ এলাকা।

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী মাঝামাঝি এসে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার পাশাপাশি আরো একটি কঠিন সমস্যা মুসলিম উম্মাহর সামনে এসেছে, তা হলো বাইরের শত্রুর আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের আক্রমণ।

ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু হয় হিজরী ৫ম শতাব্দীর (খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর) শেষদিকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণা করতে থাকেন। তারা বলতে থাকে যে, মুসলিমগণ মূর্তিপূজা করেন, তাঁরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুজা করেন, নরমাংশ ভক্ষণ করেন, যিশুখ্রিষ্টের অবমাননা করেন ইত্যাদি কথা সারা ইউরোপে প্রচারিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুসলিমদের স্পেন বিজয় ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিজয় ইউরোপের খ্রিষ্টান শাসকদেরকে ভীত করে তোলে। তাঁরা তাঁদের অভ্যন্তরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতিগত বিভেদ ও শত্রুতা ভুলে পোপের নেতৃত্বে প্যালেষ্টাইনের পবিত্রভূমি উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ঐক্যবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনী নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ৪৯১ ও ৪৯২ হিজরী সালে (১০৯৭ ও ১০৯৮ খ্রি:) প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর দশ লক্ষাধিক নিয়মিত সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া এলাকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা করেন। এই হামলায় প্রায় ২০ সহস্রাধিক মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিহত হন। ক্রুসেড বাহিনী নির্বিচারে নারীপুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেন। তাঁরা ক্ষেতখামার ও ফসলাদিও ধ্বংস করেন। এই হামলার মাধ্যমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন রাজ্য খ্রিষ্টানরা দখল করে এবং কয়েকটি খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[26]

পরবর্তী ২০০ বৎসরের ইতিহাস ইউরোপীয় খ্রিষ্টান বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা ও মুসলিম প্রতিরোধের ইতিহাস। এ সময়ে খ্রিষ্টানগণ মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম শাসকগণ বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষদিকে সালাহুদ্দীন আইউবী অধিকাংশ খ্রিষ্টান রাজ্যের পতন ঘটান এবং প্যালেষ্টাইন ও অধিকাংশ আরব এলাকা থেকে ক্রুসেডিয়ারদের বিতাড়িত করেন।[27] এরপরেও মিশর, সিরিয়া ও লেবানন এলাকায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি ছোট ছোট খ্রিষ্টান রাজ্য রয়ে যায়। তদুপরি ইউরোপ

---

[26]মাহমুদ শাকির, প্রাগুক্ত ৬/৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭।

[27]প্রাগুক্ত ৬/২৫৯-৩৫৬।

থেকে মাঝেমাঝে ক্রুসেড বাহিনীর আগমন ও বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ অব্যহত থাকে।[28]

যে সময়ে মুসলিমরা দখলদার ক্রুসেড বাহিনীর কবল থেকে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলকে মুক্ত করছেন, সে সময়ে, ৭ম হিজরী শতকের (১৩শ খ্রীষ্টিয় শতকের) শুরুতে মুসলিম সম্রাজ্যের পূর্বদিক থেকে তাতারদের বর্বর হামলা শুরু হয়। চেঙ্গিশ খানের নেতৃত্বে তাতার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬০৬ হিজরীর দিকে (১২০৯ খ্রি:) মুসলিম রাজত্বের পূর্বাঞ্চলে হামলা চালাতে শুরু করে। শীঘ্রই তারা বিভিন্ন মুসলিম জনপদে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করতে থাকে। মানব ইতিহাসের বর্বরতম হামলায় তারা এসকল জনপদের সকল প্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। বস্তুত: তাতাররা মধ্য এশিয়া, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ মুসলিম জনপদ শাব্দিক অর্থেই বিরাণ করে দেয়। পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮হি:) বলেন: ‘‘তাতাররা এসকল জনপদে কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এ প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন, বরং প্রশ্ন করতে হবে: তারা কতজনকে না মেরে বাঁচিয়ে রেখেছিল।’’[29] ৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮খ্রি:) হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করে। ৪০ দিনব্যপি গণহত্যায় তারা বাগদাদের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে।[30] পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮হি:) লিখেছেন: ‘‘হালাকু মৃতদেহ গণনা করতে নির্দেশ দেয়। গণনায় মৃতদেহের সংখ্যা হয় ১৮ লক্ষের কিছু বেশী। তখন (নিহতের সংখ্যায় তৃপ্ত হয়ে) হালাকু হত্যাকান্ড থামানোর ও নিরাপত্তা ঘোষণার নির্দেশ দেয়।’’[31]

বাইরের শত্রুর পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতা এ যুগে মুসলিম সমাজগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কোন কোন আঞ্চলিক শাসক নিজের এলাকায় কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনতে পারলেও সার্বিকভাবে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।[32]

পরবতী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪হি:), যিনি নিকট থেকে এ যুগের ঘটনাবলী জেনেছেন, তাতারদের নারকীয় বর্বরতার বর্ণনা দেওয়ার একপর্যায়ে লিখেন: ৬১৭হিজরী (১২২০খ্রি:) চেঙ্গিশ খান ও তার বাহিনীর বর্বর হামলা

---

[28]বিস্তারিত দেখুন: ; যাহাবী, আল-ই‘বার ফী খাবারি মান গাবার (বইরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমীয়্যা) ৩/১২৮-৩১২।

[29]যাহাবী, ,প্রাগুক্ত, ৩/১৭২।

[30]মাহমুদ শাকির, প্রাগুক্ত ৬/৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬: যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২৭৮।

[31]যাহাবী, আল-ই‘বার , প্রাগুক্ত, ৩/২৮৭।

[32]বিস্তারিত দেখুন: ; যাহাবী, আল-ই‘বার , প্রাগুক্ত, ৩/১১-২৮৫।

সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে। ১ বৎসরের মধ্যে তারা প্রায় সমগ্র মুসলিম জনপদ দখল করে নেয় (বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বাদ ছিল)। ... তারা এ বছরে বিভিন্ন বড়বড় শহরে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষকে হত্যা করে। মোটের উপর তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে সেখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও অনেক মহিলা ও শিশুকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মহিলাদেরকে হত্যা করে তাদের পেট ফেড়ে গর্ভস্থ শিশুকে বের করে হত্যা করেছে। যে সকল দ্রব্য তাদের প্রয়োজন তা তারা লুটপাট করেছে। আর যা তাদের দরকার নেই তা তারা পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ঘরবাড়ী সবই তারা ধ্বংস করেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে। ... মানব সভ্যতার শুরু থেকে এ পর্যন্ত এত ভয়াবহ বিপর্যয় ও বিপদ কখনো মানুষ দেখেনি .. ইতিহাসে এতবড় বর্বরতার কোন বিবরণ আর পাওয়া যায় না।[33]

এভাবে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড হামলা, সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ হিজরীর (১২৩১খ্রি:) পরে অনেক বছর মুসলিমরা ইসলামের পঞ্চম রোকন হজ্জ পালন করতে পারে নি। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর লিখছেন: "৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা হজ্জ আদায় করেন। এরপরে যুদ্ধবিগ্রহ, তাতার ও ক্রুসেডিয়ারদের ভয়ে আর কেউ হজ্জে যেতে পারেন নি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।"[34]

ইসলামী অনুশাসনের অবহেলা, পাপ-অনাচারের প্রসার, প্রশাসনিক দুর্বলতা, জুলুম অত্যাচারের সয়লাবের কারণে মুসলিমদের মধ্যে নেমে আসে ঈমানী দূর্বলতা। তাতারভীতি তাদেরকে গ্রাস করে। আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন: "তাতারভীতি মানুষদেরকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, একজন তাতার সৈনিক একটি বাজারে প্রবেশ করে, যেখানে শতাধিক মানুষ ছিল, তাতার সৈন্যটি একজন একজন করে সকল মানুষকে হত্যা করে বাজারটি লুট করে, খুনের এই হোলি খেলার মধ্যে একজন পুরুষও ঐ তাতারটিকে বাধা দিতে আগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।"[35]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী ৬ষ্ট ও ৭ম শতকের মুসলিম সমাজে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল, যা ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থবিরতা ও অবক্ষয় নিয়ে আসে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অঙ্গনে স্থবিরতা আসে। মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলিমগণ বিভিন্ন খ্রিষ্টান ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হন। অপরদিকে

---

[33]ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৮/৫৯৪-৫৯৫।

[34]ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৯/১০।

[35]ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৮/৫৯৭।

পূর্বাঞ্চলীয় তাতার ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুসলিম সম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের আচার আচরণ ও বিশ্বাস-কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। সর্বপোরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসার ফলে সমাজের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ভাবে।

সবকিছুর মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন আলেম সমাজের চেষ্টায় ইলমের প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহবানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তবে বিশাল মুসলিম সমাজের প্রয়োজনের তুলনার আলেম ও সংস্কারকদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এছাড়া সার্বিক সামাজিক অস্থিরতা, অজ্ঞতা ও অবক্ষয়ের ফলে সমাজে আলেমদের আবেদন কমতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ধরণের ইসলাম বিরোধী কর্ম সমাজে প্রবেশ করে। সমাজের সাধারণ মানুষই নয় ধার্মিক মানুষেরাও এমন অনেক কাজ করতে থাকেন যা শরী'আত সঙ্গত নয় এবং ইসলামের প্রথম যুগে কোন ধার্মিক মানুষের কাজ ছিল না। যেমন তৎকালীন সময়ে সূফীদের মধ্যে ‘‘সামা’’ বা গান বাজনার প্রসারের একটি উদাহারণের মাধ্যমে এই অবস্থা ব্যাখ্যা করতে চাই, কারণ মীলাদ অনুষ্ঠানের কর্মকান্ড বুঝতে তা আমাদের সাহায্য করবে।

ইসলামের প্রথম যুগগুলিতে ‘‘সামা’’ বা শ্রবণ বলতে শুধুমাত্র কুরআন শ্রবণ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বোঝান হত। এগুলিই তাঁদের মনে আল্লাহর ভালবাসা ও নবীর ভালবাসার জোয়ার সৃষ্টি করত। কোন মুসলিম কখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা তৈরীর দোহাই দিয়ে গান শুনতেন না। সমাজের বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসাবে গানবাজনার প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। কখনই এ সকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয় নি। তাঁরা সকলেই মূলত: কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন।[36]

কিন্তু পরবর্তী কালে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অস্থিরতা, ফিকহ, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান চর্চার অভাব, বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অনাচার প্রবেশ করে। এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি অনাচার ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গান বাজনা এক পর্যায়ে ধার্মিক মানুষদের ধর্মকর্মের অংশ হয়ে যায়। তারা একে ‘‘সামা’’ বা শ্রবণ বলতেন। তারা গানের তালে তালে নাচতে থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলতেন। কেহ বাজনা সহ, কেহবা বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে নিয়মিত

---

[36] যাহাবী, নুবালা, ১৪/৬৬-৭০।

'সামা'র মাজলিস করতেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, এ সকল গান গজল আল্লাহ ভক্তদের মনে আল্লাহর ভালবাসার জোয়ার সৃষ্টি করত। তাঁরা 'সামা'কে আল্লাহ প্রাপ্তির ও আল্লাহ প্রেম অর্জনের অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন। আর এটা জানা কথা যে, সমাজে যখন কোন কাজ ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, বিশেষত: ধার্মিক ও ভাল মানুষদের মধ্যে, তখন অনেক আলেম এসকল কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং এগুলোকে জায়েয বা ইসলাম সম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। গান বাজনার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা হয়। কোন কোন আলেম সূফীদের প্রতি সম্মান হেতু এবং হৃদয়ে গানের ফলে যে আল্লাহর ভালবাসার তথাকথিত আবেশ ও আনন্দ পাওয়া যায় তার দিকে লক্ষ্য করে এগুলোর পক্ষে মিথ্যা ওকালতি করেছেন। যেমন, প্রখ্যাত দার্শনিক গাযালী (৫০৫হি:)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ''এহইয়াউ উলুমিদ্দীন'' গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে গান বাজন ও নর্তন কুর্দনের পক্ষে যুক্তি প্রমান পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এসকল কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না।[37]

অপরদিকে সত্যনিষ্ঠ আলেম সমাজের বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন, এ সকল যুগে যেহেতু গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের পথিকদের কর্ম ছিল না, বরং সমাজের পাপী অশ্লীলতায় লিপ্ত লোকেদের কর্ম ছিল, তাই সূফী ও জাহেলদের মধ্যে বহুল প্রচলন সত্বেও তাঁরা এগুলিকে মেনে নেন নি, বরং তা রোধ করার চেষ্টা করেছেন। তবে পূর্বোক্ত ইসলামী বিশ্বের সার্বিক অবস্থা সামনে নিলে সে যুগের আলেমদের সংস্কারমূলক কাজের সীমাবদ্ধতা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তাঁরা রাষ্ট্রীয় সমর্থন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সমাজে অজ্ঞতার প্রভাব ছিল বেশী। তা সত্বেও তাঁরা সেই যুগে ইসলামের আলোর মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, সমাজের মানুষদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তাঁরাই ছিলেন দ্বীনের সঠিক মশাল। আল্লাহ তাদেরকে রহমত করুন।

খ) প্রবর্তক: ব্যক্তি ও জীবন:

আগেই বলেছি যে, মিশরের শিয়া শাসকগণ প্রথম ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে মিশরের বাইরেও কোন কোন ধর্মপ্রান মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। তবে ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরীর মাধ্যমেই এই

---

[37]আবু হামিদ আল-গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪) ২/২৯২-৩৩২।

উৎসবকে সুন্নী জগতে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। এজন্য বিভিন্ন সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ তাঁকেই ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে উল্লেখ করেছেন; কারণ তিনিই প্রথম এই উৎসবকে বৃহৎ আকারে পালন করতে শুরু করেন এবং সাধারণের মধ্যে এই উৎসবের প্রচলন ঘটান। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ সালেহী শামী (মৃত্যু: ৯৪২হি: ১৫৩৬খ্রি:) তার প্রখ্যাত সীরাতুন্নবী গ্রন্থে- (সীরাহ শামীয়া) ঈদেমীলাদুন্নবী পালনের আহবান জানাতে যেয়ে আলোচনার প্রথম দিকে লিখছেন: ‘‘সর্বপ্রথম যে বাদশাহ এই উৎসব উদ্ভাবন করেন তিনি হলেন, ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরী...’’[38]

আল্লামা যাহাবী কুকবূরীর পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে লিখছেন: ‘‘ধার্মিক সুলতান সম্মানিত বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন আবু সাঈদ কূকুবুরী ইবনে আলী ইবনে বাকতাকীন ইবনে মুহাম্মাদ আল-তুরকমানী’’[39]। তাঁরা তুকী বংশোদ্ভুত। তাঁর নামটিও তুর্কী। তুকী ভাষায় কূকুবুরী শব্দের অর্থ ‘‘নীল নেকড়ে’’।[40]

তাঁর পিতা আলী ইবনে বাকতাকীন ছিলেন ইরাকের ইরবিল অঞ্চলের শাসক। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। ক্রুসেড যোদ্ধাদের থেকে অনেক এলাকা জয় করে তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তিনি ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

বীরত্ব ও ধার্মিকতার এই পরিবেশে কূকুবুরী ৫৪৯ হি: সনে (১১৫৪ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেণ।[41] তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৪ বৎসর তখন ৫৬৩ হি: সনে (১১৬৮ খ্রি:) তাঁর পিতা মারা যান।[42] পিতার মৃত্যুর পরে কূকুবূরী ইরবিলের শাসনভার গ্রহণ করেন।[43] তিনি অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে আতাবিক মুজাহিদ উদ্দীন কায়মায তাঁর অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত হন।[44] উক্ত অভিভাবক কিছুদিনের মধ্যেই কুকুবুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কুকুবুরীকে শাসনকার্য পরিচালনায় অযোগ্যতার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর ভাই ইউসুফকে ক্ষমতায় বসান।[45] কূকুবুরী তখন ইরবিল ত্যাগ করে ইরাকের মাওসিল অঞ্চলের শাসক সাইফুদ্দীন গাযী ইবনে মাউদূদের নিকট গমন করেন। তিনি কুকুবুরীকে মাউসিলের শাসনাধীন হাররান অঞ্চলের শাসক হিসাবে

---

[38]আস-সালেহী, সীরাত, প্রাগুক্ত, ১/৩৬২।

[39]যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৪।

[40]ইবনে খাল্লিকান, ওয়াইয়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, ৪/১২১।

[41]যিরিকলী, মুহম্মদ খাইরুদ্দীন, আল-আ'লাম, প্রাগুক্ত, ৫/২২৭।

[42]যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩২৫; আল-ই'বার, প্রাগুক্ত, ৩/৪০, ২০৮পৃ।

[43]যাহাবী, আল-ই'বার , প্রাগুক্ত, ৩/২০৮পৃ।

[44]যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৫।

[45]প্রাগুক্ত।

নিয়োগ করেন।[46] কিছুদিন হাররানে অবস্থান করার পরে তিনি যে যুগের প্রসিদ্ধ বীর, মিসর ও সিরিয়ার শাসক গাজী সালাহুদ্দীন আল-আইউবীর দরবারে যোগ দেন। তিনি সালাহুদ্দীনের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সালাহুদ্দীন কুকুবুরীর বীরত্বে ও কর্তব্যনিষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁর বোন রাবীয়া খাতুনের সাথে কুকবুরীর বিবাহ দেন এবং তাকে হাররান ও রুহা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন।[47] ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭খ্রি:) হিত্তীনের যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইউবীর মুসলিম বাহিনী সম্মিলিত খৃষ্টান ক্রুসেড বাহিনীকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করে এবং জেরুজালেম ও সমগ্র প্যালেষ্টাইন থেকে ইউরোপীয় বাহিনীর চুড়ান্ত পরাজয়ের সূচনা করে।[48] এই যুদ্ধে কুকুবুরী অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ সময়ে তাঁর ভাই ইরবিলের শাসক ইউসুফ মারা যান। তখন সালাহুদ্দীন কুকুবুরীকে পুনরায় ইরবিলের শাসনক্ষমতা প্রদান করেন।[49]

কুকবুরী অত্যন্ত ধার্মীক ছিলেন। পরবতী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবী (মৃ: ৭৪৮ হি:) বলেন: "যদিও তিনি (কুকবুরী) একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন সচেচেয়ে বেশী ধার্মিক, সবচেয়ে বেশী দানশীল, সমাজকল্যানেব্রত ও মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম। প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের জন্য তিনি যে পরিমান অর্থব্যয় করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মত উচ্চারিত হত।"[50] তিনি শাসন কার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন।[51]

আবু সাঈদ কুকবুরীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইয়াকুত আল-হামাবী (মৃত্যু ৬২৬হি:) কুকবুরীর বর্ণনা দিকে গিয়ে লিখেছেন: "আমীর মুযাফ্ফরুদ্দীন কূকুবূরী এই ইরবিল শহরের উন্নয়নমূলক প্রভুত কর্ম করেন। এই আমীরের চরিত্র বৈপরিত্যময়। একদিকে তিনি প্রজাদের উপর অনেক জুলুম অত্যাচার করেন, অবৈধভাবে প্রজাদের নিকট থেকে সম্পদ সংগ্রহ করেন। অপরদিকে তিনি কুরআন পাঠক ও ধার্মিক মানুষদের সাহায্য করেন, দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য তাঁর দানের হাত খুবই প্রশস্ত। কল্যাণকর্মে তিন মুক্তহস্তে ব্যয় করেন, অমুসলিমদের নিকট বন্দী মুসলিমদেরকে টাকার বিনিময়ে মুক্ত করেন...।"[52]

---

[46]প্রাগুক্ত।

[47]প্রাগুক্ত। সালাহুদ্দীন আইউবীরা ৬ভাই ও দুই বোন ছিলেন। যাহবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/৫৪।

[48]যাহাবী, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/৮৫, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত, ৮/৪৭০-৪৭৩, মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, ৬/৩৩২।

[49]যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত, ২২/৩৩৫, আল-ইবার , প্রাগুক্ত, ৩/২০৮।

[50]যাহাবী, প্রাগুক্ত, ৩/২০৮।

[51]আল-যিরিকলী, আ''লাম, প্রাগুক্ত, ৫/২৩৭।

[52]ইয়াকুত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৭৯)

কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে কুকবূরী ৬৩০ হিজরীর ৪ঠা রমযান (১৩/৬/১২৩৩ খ্রি:) মারা যান।[53] তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্যতম কর্ম যা তাকে সমসাময়িক সকল শাসক থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং ইতিহাসে তাকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে তা হলো ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের প্রচলন। তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত দীঘ প্রায় ৪৫ বৎসরের শাসনামলের কোন বছরে প্রথম এই অনুষ্ঠান শুরু করেন তা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি। প্রখ্যাত বাঙ্গালী আলেমে দীন, মাওলানা মোহাম্মদ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন।[54] তিনি তাঁর এই তথ্যের কোন সূত্র প্রদান করেন নি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন। ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন: ‘‘৬০৪ হিজরীতে ইবনে দেহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন কূকুবূরী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদযাপন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে বিশাল উৎসব করেন। তখন তিনি তাঁর জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন...।’’[55]

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে আগমনের কিছু পূর্বেই কূকুবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন, এজন্যই ইবনে দেহিয়া ইরবিলে এসে তাকে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করতে দেখতে পান। তবে উদযাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশী আগে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ বিষয়টি ইবনে দেহিয়া আগে জানতেন না, এতে বোঝা যায় তখনো তা পার্শবর্তী দেশগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কূকুবূরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে বা ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ পালন শুরু করেন।

গ) প্রথম মীলাদ গ্রন্থ লেখক: ব্যক্তি ও জীবন:

মীলাদ অনুষ্ঠান প্রচলন করার ক্ষেত্রে আরেক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা না করলে সম্ভবত: আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন ‘‘মীলাদুন্নবী’’র উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান, ইবনে দেহিয়া আল-কালবী (৬৩৩হি:), যার গ্রন্থ পরবর্তীতে ‘‘মীলাদ’’ কেন্দ্রীক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস ছিল। মীলাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের জন্য কুকবুরী তাকে একহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)

১/১৩৮।

[53]যাহাবী, আল-ইবার ৩/২০৮, নুবালা ২২/৩৩৭, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/১৮।

[54]মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ, হাকিকতে মোহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী (পার্বত্য চট্টগ্রাম, মোহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, প্রথম সংস্করণ) ৩০১-৩০২পৃ।

[55]ইবনে খাল্লিকান ৩/৪৪৯। আরো দেখুন: ১/২১১, ৪/১১৯

পুরস্কার প্রদান করেন।[56]

ইবনে দেহিয়া ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০খ্রী) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩৩হিজরীতে (১২৩৫খ্রী) মিশরে মারা যান। প্রায় ৯০ বৎসরের জীবনে তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ভ্রমন করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে তাঁর অবদান রাখেন। তবে লক্ষ্যনীয় যে ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথম পুস্তক লেখক ইবনে দেহিয়া সমসাময়িক বা পরবর্তী আলেম ও লেখকদের প্রশংসা অর্জন করতে পারেন নি। বরং সকল ঐতিহাসিক ও লেখক তাঁর কর্মময় জীবনের বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর কিছু কিছু আচরণ ও কর্মের সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা জিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ আল-মাকদেসী (৫৬৯-৬৪৩হি:) বলেছেন: "আমি ইস্পাহানে তাকে দেখেছি। তবে তাঁর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কারণ তাঁর অবস্থা আমার ভাল লাগেনি। তিনি ইমামদের খুবই নিন্দামন্দ করতেন।"[57] আল্লামা যাহাবী লিখেছেন: "তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, আরবী ভাষা ও হাদীস শাস্ত্রে তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে জয়ীফ বা দুর্বল ছিলেন।"[58] তাঁর এই স্বভাবের কারণে তিনি যখন মরক্কো ও তিউনিসিয়া অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন তখন সে দেশের আলেমগণ একত্রে তার বিরুদ্ধে, তাঁকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষনা দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র লিখেন।[59]

ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল গনী, ইবনে নুকতা (৬২৯হি:) লিখেছেন: "তিনি বড় জ্ঞানী ও মর্যাদার অধিকারী হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের বিষয়ে এমন অনেক বিষয় দাবী করতেন যা ছিল একেবারেই অবাস্তব। তিনি দাবী করতেন যে, সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযী তাঁর মুখস্ত রয়েছে। একজন ছাত্র পরীক্ষামূলক ভাবে সহীহ মুসলিমের কয়েকটি হাদীস, সুনানে তিরমিযীর কয়েকটি হাদীস ও কয়েকটি বানোয়াট বা মাওযু হাদীস একত্রে লিখে তাঁকে দেন। তিনি হাদীসগুলো পৃথক করতে বা কোনটি কোন কিতাবের হাদীস তা জানাতে পারেন নি।"[60] আল্লামা যাহাবী বলেন: "তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ ও জয়ীফ বর্ণনার

---

[56]যাহাবী, নুবালা ২২/৩৩৬, আস-সালেহী, সীরাত ১/৩৬২, ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।

[57]যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১।

[58]যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১।

[59]যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯১। মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৬।

[60]যাহাবী, নুবালা ২২/৩৯২। আরো দেখুন: সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান, তাবাকাতুল হুফফায (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩) ৫০১ পৃ.।

ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা খুবই আপত্তিকর।"[61]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হি:) ঐতিহাসিক ইবনে নাজ্জার (৬৪৩হি:) থেকে বর্ণনা করেছেন: "আমরা দেখেছি, সকল মানুষ একমত ছিলেন যে, ইবনে দেহিয়া মিথ্যা কথা বলেন এবং বিভিন্ন অসত্য দাবী করেন।"[62]

ইবনে হাজার আসকালানী অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন: "তাঁর সমসাময়িক এক আলেম বলেন: একদিন আমি সুলতানের দরবারে ছিলাম, যেখানে ইবনে দেহিয়াও ছিলেন। সুলতান আমাকে একটি হাদীস জিজ্ঞাসা করলে আমি হাদীসটি বলি। তখন তিনি আমাকে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন হাদীসটির সনদ মনে করতে পারি না এবং আমার অপারগতা জানাই। পরে আমি দরবার ত্যাগ করলে ইবনে দেহিয়া আমার সাথে আসেন এবং বলেন: যখন সুলতান আপনাকে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন যে কোন একটি বানোয়াট সনদ বলে দিলে আপনার কি ক্ষতি হতো? সুলতান ও তার দরবারের সবাই জাহেল, তারা কিছুই বুঝতে পারত না। তাতে আপনাকে 'জানি না' বলতে হতো না এবং উপস্থিত সভাসদদের কাছে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। উক্ত আলেম বলেন: ইবনে দেহিয়ার এই কথায় আমি বুঝতে পারলাম তিনি মিথ্যা বলতে পরোয়া করেন না।"[63]

ইবনে হাজার আসকালানী অন্য একজন সমসাময়িক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন: "ইবনে দেহিয়া যখন ইস্পাহানে আসলেন তখন আমার পিতার খানকায় আসতেন। আমার আববা তাকে খুবই সম্মান করতেন। একদিন তিনি আমার আববার কাছে একটি জায়নামাজ নিয়ে আসেন এবং জায়নামাজটি তার সামনে রেখে বলেন: এই জায়নামাজে আমি এত এত হাজার রাকাত নামায আদায় করেছি এবং আমি কা'বা শরীফের মধ্যে এই জায়নামাজে বসে কয়েকবার কুরআন করীম খতম করেছি। আমার আববা খুবই খুশী হয়ে জায়নামাজটি গ্রহণ করেন এবং মাথায় রাখেন ও চুমু খেতে থাকেন। তিনি এই হাদীয়া পেয়ে খুবই খুশি হন। এ দিকে কাকতালীয় ভাবে সন্ধ্যার দিকে একজন স্পাহানী স্থানীয় ব্যক্তি আমাদের কাছে আসেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন: আপনাদের খানকায় যে মরোক্কীয় আলেম আসেন তাকে দেখলাম বাজার থেকে অনেক দামে একটি খুব সুন্দর জায়নামাজ কিনলেন। তখন আমার আববা (একটু খটকা লাগায়) ইবনে দেহিয়ার প্রদত্ত জায়নামাজটি আনতে বলেন। জায়নামাজটি দেখে ঐ ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে এই জায়নামাজটিই কিনতে দেখেছে ইবনে দেহিয়াকে। এতে আমার আববা চুপ হয়ে যান এবং আমাদের মন থেকে ইবনে

---

[61]মিযানুল ইতিদাল ৩/১৮৮।

[62]ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ) ৪/২৯৫।

[63]ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান ৪/২৯৫।

দেহিয়ার প্রতি সকল সম্মান চলে যায়।''[64]

আল্লামা ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি:) লিখেছেন: ''ইবনে দেহিয়া সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। বলা হয় তিনি মাগরিবের নামায কসর করার বিষয়ে একটি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন। আমার ইচ্ছা ছিল হাদীসটির সনদ দেখব, কারণ সকল মুসলিম আলেম একমত যে, মাগরীবের নামায কসর হয় না... আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাঁকে দয়া করে ক্ষমা করে দিন।''[65]

ইবনে দেহিয়ার মিথ্যাচার সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রদান করেছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (৬৮১ হি:)। ইবনে দেহিয়ার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁর লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়। তাঁর লেখা মীলাদের বইটি তিনি ৬২৫ হিজরীতে কুকবুরীর দরবারে বসে পড়তে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।[66] কিন্তু তিনি আশ্চার্য্য হন যে, উক্ত বইয়ের শেষে ইবনে দেহিয়া একটি বড় আরবী কসীদা লিখেছেন কুকবূরীর প্রশংসায়। তিনি দাবী করেছেন যে, কসীদাটি তিনি নিজে লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইবনে খাল্লিকান জানতে পারেন যে, কবিতাটি সিরিয়ার হালাবশহরের বাসিন্দা কবি আস'আদ ইবন মামাতীর (মৃত্যু ৬০৬হি:) লেখা ও তাঁর কাব্য গ্রন্থে সংকলিত, তিনি উক্ত কসীদা দ্বার তৎকালীন অন্য একজন শাসকের প্রশংসা করেন।[67]

সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ইবনে দেহিয়া যে যগের একজন বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন। যে গ্রন্থটি তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে তা হলো ''মীলাদুন্নবী'' বা রাসূলুল্লাহরে জন্মবিষয়ে লেখা তার বই ''আত- তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর আন-নাযির''। কারণ এটিই ছিল ''মীলাদুন্নবী'' বা রাসূলুল্লাহরে জন্মবিষয়ে লেখা প্রথম বই। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে প্রবেশ করেন। তিনি বছর দুয়েক সেখানে বাদশাহ কূকুবূরীর রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি এই বইটি সংকলন করেন। ৬০৬ হিজরীতে তিনি এই বইটি লেখা সমাপ্ত হলে তা কূকুবূরীকে পড়ে শোনান।[68]

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা তৎপরবর্তী মুসলিম সমাজের আলেমগণ ৬০০ বৎসর যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকে কেন্দ্র করে কি একটি বইও

---

[64]ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান ৪/২৯৬।

[65]ইবনে কাসীর , আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/২৬।

[66]ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১২, ৩/৪৪৯-৪৫০।

[67]ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১১-২১২, ৩/৪৫০।

[68]ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত ১/২১২, ৩/২৯, ৪/১১৯।

লিখেন নি?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে সেই যুগগুলির অবস্থা বুঝতে হবে। প্রথম যুগের মুসলিমগণ, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সাবক্ষণিক কর্ম ও ব্যস্ততা ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে। তাঁদের সকল আবেগ, ভালবাসা ও ভক্তি দিয়ে তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও কর্ম জানতে, বুঝতে, শেখাতে ও লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাদের কর্মকান্ডের যে বর্ণনা হাদীস শরীফে ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের যুগে লিখিত ও সংকলিত যে সকল বই পুস্তকের বর্ণনা আমরা পাই বা যে সকল বই পুস্তক বর্তমান যুগ পর্যন্ত টিকে আছে তার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা মূলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, চরিত্র, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি, জীবনপদ্ধতি জানতে বুঝতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর জীবনী সংকলনের দিকে যে যুগের মুসলিমদের মনোযোগ দেখা যায় না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও তাঁর প্রবর্তিত বিধানাবলীর দিকটায় তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বা জীবনী রচনার দিকে তারা গুরুত্ব প্রদান করেন নি। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন, জন্ম তারিখ বা জন্মমাস নিয়ে কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। স্বভাবত:ই তাঁর জন্ম কেন্দ্রীক কোন গ্রন্থও তখন রচিত হয়নি। প্রথম তিন শতাব্দীতে রচিত হাদীস গ্রন্থ সমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত যৎসামান্য কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আগে আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে সীরাতুন্নাবী বা নবী জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হতে থাকে বলে মনে হয়। তবে এ যুগে মূলত: সীরাতুন্নাবীর মাগাযী বা যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক বিষয়েই বিশেষভাবে লিখা হত।[69] দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের উল্লেখযোগ্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থ হল মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (মৃত্যু ১৫১হি:/৭৬৮খ্রি:), আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮হি:/৮৩৪খ্রি:), মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (২৩০হি:/৮৪৫খ্রি:) প্রমুখের লিখা "সীরাতুন্নবী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মসংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া ৩য় হিজরী শতক থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মসংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন খলীফা ইবনে খাইয়াত 'শাবাব' আল উসফুরী (২৪০হি:/৮৫৪খ্রি:), আহমদ ইবনে ইয়হইয়া আল বালাযুরী (২৭৯হি:/৮৯২খ্রি:), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে জরীর (৩১০হি:/৯২৩খ্রি:) ও অন্যান্য

[69]ফুয়াদ সিযকিন, তারিখুল তুরাস আল আরাবী (সৌদি আরব, রিয়াদ, আল-ইমাম বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সংস্করণ ১৯৮৩), প্রথম খন্ড, ২য় অংশ, ৬৫-৮৬ পৃ।

ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ। ৫ম হি: শতক থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক সংঘটিত মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী পৃথকভাবে সংকলিত করে "দালাইলুন নুবুওয়াত" নামে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা হয়, যেমন আবু নু'আইম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসফাহানী (৪৩০হি:/১০৩৯খ্রি:) ও আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল- বাইহাকী (৪৫৮হি:/১০৬৬ খ্রি:) সংকলিত "দালাইলুন নুবুওয়াত" গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কালীন অলৌকিক ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। সর্বাবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ কেউই রচনা করেন নি। বস্ত্তত: তাঁর জন্ম উদযাপন যেমন ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অজানা ছিল, তেমনি তাঁর জন্ম বা "মীলাদ" নিয়ে পৃথক গ্রন্থও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে কেউ রচনা করেন নি। কারণ তাদের কাছে জন্ম বৃত্তান্ত বড় কোন বিষয় বলে বিবেচিত হতো না।

উপসংহার:

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মিশরের ইসমাঈলীয় শাসকগণ দ্বারা প্রবর্তিত হলেও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে অন্যতম উৎসবে পরিণত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ইবরিলের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরীর। তাঁকেই আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে মনে করতে পারি। এর অন্যতম প্রমাণ হলো ৪র্থ হিজরী শতকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হলে তার কোন প্রভাব বাইরের মুসলিম সমাজগুলোতে পড়ে নি। এমনকি পরবতী ২০০ বৎসরের মধ্যেও আমরা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোথাও এই উৎসব পালন করতে দেখতে পাই না। অথচ ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে কুকবূরী ইরবিলে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করলে তা তৎকালীন মুসলিম সমাজগুলিতে সাড়া জাগায়। পরবর্তী ২০০ বৎসরের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম সমাজে অনেক মানুষ ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করে।

যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা উৎসব হিসাবে প্রচলিত, পরিচিত বা আচরিত ছিল না, পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসাবে প্রচলিত হয়েছে সে সকল কাজ কখনো পরবর্তী যুগের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না।

যেহেতু মিশরের শাসকগণ ও পরবর্তীকালে আবু সাঈদ কূকবুরী প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোন অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই স্বভাবত:ই

তা বিদ'আত ও পরিত্যাজ্য। সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাঁদের প্রচন্ডতম নবীর ভালবাসা সত্ত্বেও কখনো তাঁদের আনন্দ এভাবে উৎসব বা উদযাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি, কাজেই পরবর্তী যুগের মুসলিমদের জন্যও তা শরী'আত সঙ্গত হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলিমদের উচিৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের ন্যায় সার্বক্ষণিক সুন্নাত পালন, সীরাত আলোচনা, দরূদ ও সালাম এবং আন্তরিক ভালবাসার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানো। অমুসলিমদের অনুকরণে জন্মদিন পালনের মাধ্যমে রাসূলের ভালবাসা প্রকাশ পায় না। বরং এ সকল অনুষ্ঠানের প্রসার সাহাবীদের ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা সৃষ্টি করে, কারণ যারা এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, তাঁদের মনে হতে থাকবে যে সাহাবীদের মত নীরব, অনানুষ্ঠানিক, সার্বক্ষণিক ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটাই উত্তম। যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে বহু আলেম সাবধান করে গেছেন। যেমন, সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম আলেম ইমাম আল্লামা তাজুদ্দীন উমর ইবন আলী আল-ফাকেহানী (মৃত্যু: ৭৩৪ হিজরী/ ১৩৩৪খ্রি:), আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবন মুহম্মদ ইবনুল হাজ্জ (৭৩৭হি:/১৩৩৬খ্রি:), ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন মূসা ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি:) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।[70]

আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। রবিউল আউয়াল মাস যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মাস, তেমনি তাঁর মৃত্যুর মাসও বটে। তাই এটি দুঃখের কারণ হতে পারে। কোন কোন বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ৭ম হিজরী শতাব্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুন্নবী পালন অনেক দেশের মুসলিমদের কাছে অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না করে মৃত্যু দিবস পালন করতেন। বস্তুত: এ সবই গর্হিত বিদ'আত। ইসলামে বিদ'আতের কোন স্থান নেই। তাই জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস এসব পালন থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহই আমাদের সহায় হোন ও তৌফিক দিন। দো'আ করি তিনি দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আল্লাহর মহান রাসূল, হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর উপর অগণিত সালাত ও সালাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া

---

[70]বিস্তারিত দেখুন: আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, আল-ই'তিসাম (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনে আফফান, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫) ২/৫৪৮, আস সালেহী, আস-সীরাতুশ শামিয়্যা, প্রাগুক্ত ১/৩৬২-৩৭৪।

সাল্লিম মা যাকারুয যাকিরুন ওয়া গাফালা আন যিকরিহিল গাফিলূন।